দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...2 0 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম...২...

এমসিকিউ ও সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়া প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন-এমসিকিউ) উঠাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় তাহারা এই পরামর্শ দেন। একই সাথে তাহারা নোট, গাইডবই নিষিদ্ধ, শিক্ষাক্রম সংশোধন করিয়া বইগুলি সহজভাবে তৈরি, প্রশ্নব্যাংক তৈরি করিয়া সেখান হইতে পরীক্ষা নেওয়াসহ বেশকিছু সুপারিশ করেন। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দুই ভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এমসিকিউ এবং ৬০ নম্বর সৃজনশীল পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, আগামী বৎসর হইতে এমসিকিউ ১০ নম্বর কমানো হইবে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় আজকাল পাস ও জিপিএ-৫ পাওয়ার হার বাড়িলেও অনেকেই শিক্ষার মান নিয়া উদ্বিগ্ন। আবার সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়াও আছে হাজারও প্রশ্ন। এমতাবস্থায় সকলের সুপারিশের ভিত্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার এবং সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এমসিকিউ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা মাপা যায় না। এই পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নে চারটি উত্তর দেওয়া থাকে যাহার মধ্যে একটি সঠিক। সঠিক উত্তরটিতে শিক্ষার্থীদের টিক চিহ্ন দিতে হয় বা খালি ঘর পূরণ করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে শিক্ষার্থীরা মূল বইটি আদ্যোপ্রান্ত পড়ে। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইহার কারণেও গাইড নির্ভরতা বাড়িয়াছে। এই পদ্ধতিতে কম্পিউটারে দ্রুত ফলাফল নির্ধারণ করা যায় বটে। ফলে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি এবং চাকুরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বহুলাংশে। তবে ইহার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের প্রকাশ ও ব্যবহারিক ক্ষমতাও হ্রাস পায়। অন্যদিকে সৃজনশীল পদ্ধতির কারণে পুরা শিক্ষা ব্যবস্থায় তালগোল সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষকদের অনেকে এখনও ইহা ঠিকমতো উপলব্দি করেন না এবং সেই অনুযায়ী পারেন না প্রশ্ন করিতে। এখানে সৃজনশীল ধারণার ভুল প্রয়োগ হইতেছে বেশি। আসলে শিক্ষার্থীরা টেক্সট বুক অনুসরণ করিয়া তাহার আলোকে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর নিজের মেধা ও প্রতিভা খাটাইয়া নিজের মত করিয়া দিতে পারে কিনা তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ইহাতে একেকজনের প্রকাশভঙ্গি ও কৌশল একেক রকম হওয়ার কারণে প্রত্যেকের উত্তরমালায় স্বাতন্ত্র ধরা পড়িবার কথা। কিন্তু প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তর প্রদানে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় গাইড বই অনুসরণ করার কারণে তাহা সম্ভব হইতেছে না। এইজন্য সহজ-সরলভাবে কারিকুলাম তৈরির পাশাপাশি প্রত্যেক বইয়ের শেষে বা অধ্যায় অন্তর কিছু প্রশ্নের সমাহার দেওয়া যাইতে পারে যাহার উত্তর শিক্ষার্থীরা দিবে নিজের মত করিয়া। উত্তর মূল্যায়নে এখানে স্বকীয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশকে প্রাধান্য দিতে হইবে। তবে কিছু প্রশ্ন মূল বই হইতে এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যাহাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শিক্ষার্থীরা বইটি আগাগোড়া পড়িয়াছে। এইসব প্রশ্ন উহ্য থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং দক্ষ প্রশ্নকর্তাদের দ্বারাই তাহা প্রণয়ন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনিবার্য।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কী সরকারি কী বেসরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজ ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। তথাকথিত ভালো স্কুলগুলিতেও হয় না। সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের বদলে সবকিছু হইয়া পড়িয়াছে কেবলই পরীক্ষা এবং কোচিং-টিউশন নির্ভর। ইহাতে মৌলিক বইয়ের তুলনায় আগের মতই নোট-গাইডের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। তাহারা একদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যদিকে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনির পিছনে সময় ও অর্থ খরচ করিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে। ইহাতে উভয়েরই টেনশন বাড়িয়াছে। মধ্যখান হইতে শিক্ষার্থীদের মধুরময় শৈশব হারাইয়া যাইতেছে। আর বাবা বা মায়েদের কর্মজীবন ক্ষতির কারণ হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে যেমন শুধু মূল ও বোর্ড বইয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সত্যিকার অর্থে লেখাপড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে। এইজন্য উপরোক্ত সুপারিশমালা মানিয়া চলা একান্ত জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি।